(স্ত্রী রমাদেবীকে লেখা ন'টি পত্র)

৪১, মির্জাপুর স্ট্রীট

৩রা আশ্বিন '৪৭ সাল,

বৃহস্পতিবার।

কল্যাণীয়াসু,

আজই ওবেলা তোমার পত্র পেলুম এবং তোমার শরীর ভাল আছে জেনে আনন্দ হোল। তোমার রাগের আমি মূল্য দিইনে, কল্যাণী? তোমার রাগের ভয়ে কতবার যা তুমি বলেচ তাই শুনেছি। তবে সেদিন ওই ব্যাপারটা ছিল তাই তোমার সাগ্রহ আহ্বানের সম্মান রাখতে পারি নি, সেজন্য কিছু মনে করতে পারবে না কিন্তু। কিছু মনে আসে যদিও, স্নেহভরে উপেক্ষা করো।

সেদিন ওরা মানপত্রের সঙ্গে এই যে চিঠির কাগজে তোমায় লিখচি, এরকম তিনশো কাগজের প্যাড বাঁধিয়ে দিয়েচে—নাম ছাপানো সুদ্ধ। আর দিয়েছে একটা পার্কার vacumatic পেন, একটা রূপোর সিগারেট কেস। এ ছাড়া অনেক ফুল, মালা, ফুলের তোড়া ইত্যাদি। অনেক লোক এসেছিল। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেছিল। গান, আবৃত্তি প্রবন্ধপাঠ, কবিতা-পাঠ হয়েছিল। যখন জিনিসগুলো নিয়ে, বিশেষতঃ ফুলগুলো নিয়ে মেসে ফিরলুম, তখন তোমার কথা এত মনে হচ্ছিল! তুমি থাকলে ফুলগুলো দিয়ে দিতুম, জিনিসগুলো দেখাতুম। মায়াকে সভায় আনবো ভেবেছিলুম—কিন্তু তারাশঙ্কর আর একটা কোথাকার সভা সেরে কখন আসবে তার স্থিরতা ছিল না বলে মায়াকে আনা হয়নি—বিশেষ করে বেলা ২৷৷০টার সময় বৌবাজারে আমায় 'কৃষ্টিকলা' সাহিত্য সমিতিতে সভাপতিত্ব করতে হয়েছিল। মায়াকে আনার সময়ই পাওয়া গেল না।

ধূমকেতু দেখার সুযোগ ঘটে নি। ছেলেবেলায় হ্যালির ধূমকেতু উঠেছিল শুনেছি মাত্র। কিন্তু তখন খুব ছেলেমানুষ, পাড়াগাঁয়ে থাকি—কেউ দেখায় নি। সে আজ ত্রিশ বছর আগের কথা। তোমার ভাল লাগবে বলে তোমার ফরমাশ মত তো ধূমকেতু উঠতে পারে না। এখনও ৪৫ বছর দেরি আছে আবার সেটা ফিরে আসতে। ততদিন অপেক্ষা কর।

এখন তোমার বয়েস ১৫ তো? ১৫+৪৫=৬০ বছর যখন তোমার বয়েস হবে, তখন। যদি ধূমকেতু দেখতে পাও—আমার কথা তোমার মনে হবে কি তখন? আমি তখন মরে ভূত হয়ে যাবো। তুমি তখন বৃদ্ধা, নাতিপুতি বেষ্টিতা হয়ে গল্প করবে বসে সন্ধ্যাবেলায়। নাতনীকে আঙুল দেখিয়ে বলবে—এই দ্যাখ রেখা, হ্যালির ধূমকেতু উঠেছে—বিভূতিবাবু বলে একজন লোক আমার ছেলেবেলায় আমায় বলেছিল, এ ধূমকেতু আমি দেখবো। আজ বিভূতিবাবুর কথা মনে পড়ছে।

রেখা বলবে—কে বিভূতিবাবু ঠাকুরমা?

তুমি বলবে—ওই আমাদের সেকেলে একজন লেখক ছিল, বেশ বইটই লিখতো—

রেখা ভবিষ্যৎ যুগের মেয়ে তো—তাই ছোট বোন শিখার দিকে চেয়ে মুচকি হেসে বলবে—ঠাকুরমার সব যেমন কথা তাই। কোথাকার কে বিভূতিবাবু, সে নাকি আবার বই লিখতো! আমাদের নবজীবনবাবু কি প্রদীপবাবুর মত লেখক কোন কালে বাংলাদেশ দেখেচে ? ঠাকুরমার সব সেকেলে ঢং—তারপরে দুইবোনে খিলখিল করে হেসে উঠবে।

আর আমি ? কোথায় তখন আমি ?...হায় রে!

মৃত্যুলোকের পার থেকে হয়তো সস্নেহ দৃষ্টিতে ভবিষ্যৎ যুগের নবীনা বালিকা দুটির দিকে চেয়ে ভাববো—একদিন ওদের ঠাকুরমা ওইরকম বালিকা ছিল, ওদের মতই। তার নাম কল্যাণী কিন্তু নাতনীরা হয়তো সে নাম জানে না। বুড়ী ঠাকুরমার নাম জানবার জন্য তাদের তত আগ্রহ নেই, নিজেদের প্রসাধন নিয়েই ব্যস্ত। তরুণ মাত্রই স্বার্থপর কিনা—নিজেদের কথা ছাড়া অপরের কথা ভাববার অবকাশ বা স্পৃহা ওদের বড় একটা থাকে না।

জ্যোৎস্নার কথা তুমি লিখেচ, আমার ভাই লিখেচে ঘাটশিলার মাঠ বন জ্যোৎস্নালোকে অদ্ভুত হয়েছে দেখতে, সেবা লিখেচে শিলং-এ এবারে নাকি অদ্ভুত জ্যোৎস্না। গত শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্না নিশ্চয় খুব অদ্ভুত না হলে তিন জায়গা থেকে তিনজনে লেখে নি—কিন্তু হায়! আমি জ্যোৎস্নার এতটুকু দেখি নি। আকাশের চাঁদ দেখেচি হয় তো, ভেবেচি—আজ দেখচি চাদ বেশ বড়, বোধ হয় একাদশী কি চতুর্দশী তিথি হবে—এই পর্যন্ত। সে চাঁদের জ্যোৎস্না মাটির পৃথিবীতে পড়তে দেখি নিবেচারী চাঁদের সাধ্য কি বিংশ শতাব্দীর আধুনিকতম সুসভ্য শহর কলকাতার বৈদ্যুতিক আলোর ব্যূহ ভেদ করে তার আলো পাঠাতে সাহস করে সেখানে?

আমি তোমার জন্মভূমিকে ভালবাসি কিনা জিগ্যেস করেচ—নিশ্চয়ই বাসবো। তোমার যখন জন্মভূমি তখন সে আমার শ্রদ্ধার পাত্রী নিশ্চয়ই। তবে চোখে না দেখলে তো ভালবাসা যায় না, একদিন সুতরাং দেখার আগ্রহ রইলো। ফটো নিশ্চয়ই পাবে। আমার মনে আছে তবে এই সময়টা বড় ব্যস্ত আছি বলে পরিমলকে দিয়ে ফটো তুলবার অবসর পাচ্ছিনে। পূজার সময় ঠিক পাবে।

আচ্ছা আমার ভ্রমণতালিকা বনগাঁয়ে গিয়ে তোমাদের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করা যাবে। তোমাদের মানে তুমি আর বেলু, আর অবিশ্যি মায়া যদি ওখানে সে সময় থাকে। তবে চাটগাঁ যেতেই হবে যদি গোয়ালিয়র যাওয়া না ঘটে—রেণু আবার একখানা চিঠি দিয়েছে। চাটগাঁয়ে যেতেই হবে, নইলে সে নাকি রাগ করবে। এ মাসের প্রবাসীতে আমার 'সুলোচনার কাহিনী' গল্পটা বেরিয়েচে। ওখানে 'প্রবাসী' পাও তো পড়ে দেখো—নয়তো আমি নিয়ে যাবো এখন। সেদিনকার সেই প্লটটা নিয়ে 'বাক্সবদল' নাম দিয়ে গল্পটা লিখেচি কার্তিক মাসের শারদীয়া সংখ্যা 'বঙ্গশ্রী'তে বেরুবে। মায়ার সেই বাক্সবদলের কথা—মনে আছে তো?

আশা করি কুশলে আছো। তুমি আমার স্নেহাশীর্বাদ নিও—বেলু ও অন্যান্য বালকবালিকাদের স্নেহাশীর্বাদ জানিও।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পুঃ—তোমার জন্য ভাল কাঁচের চুড়ি নিয়ে যাবো। হাতের মাপ দরকার হবে না? সুতো দিয়ে হাতের মাপ পাঠালে কেমন হয়? এসব কারবার কখনো করিনি, জানা নেই মোটেই। তাই পরামর্শ দিয়ে সাহায্য কোরো লক্ষ্মটী।

তুমি অমন কেন লিখেচ—"অনেক অপরাধ করেচি, ক্ষমা করুন।" ওতে মনে ভারি কষ্ট পাই, কল্যাণী—অমন লিখো না।

(২)

প্যারাডাইজ লজ
৪১, মির্জাপুর স্ট্রীট
কলিকাতা
১৬ই আশ্বিন, '৪৭ সাল

কল্যাণীয়াসু,

এসে অবধি মন সত্যিই বড় উতলা হয়ে রয়েচে, কল্যাণী। এবার যেন কিছু ভাল লাগছে না। ঘাটশিলা যাইনি, কাজ এখনও মেটাতে পারি নি, আগামীকাল (বুধবার) সকালে নাগপুর প্যাসেঞ্জারে নিশ্চয়ই যাবো। তুমি সঙ্গে

থাকলে কি ভালই লাগতো! আমি চলে এলুম, সেই যে তুমি, মায়া, বেলু জানলায় দাঁড়িয়ে রইলে সেই কথাই মনে হচ্ছে। তুমি যে অত ভোরে উঠে এলে, আমায় অনুরোধ করলে থাকবার জন্যে, তোমার সেই ছবিই কেবল মনে হচ্ছে।

আজ মহালয়ার ছুটি ছিল, কিন্তু আমার এখানে সকাল থেকেই কেবলই লোকের ভিড়। একদল যায়, আর একদল আসে। বিরক্ত হয়ে বেলা সাড়ে নটার সময় বেরিয়ে পড়লাম। সজনীর ওখানে গিয়ে দেখি প্রকাণ্ড আড্ডা বসেছে সেখানে—তারাশঙ্কর, ব্রজেনদা, সাঁতারু শান্তি পাল, সম্বুদ্ধ, সজনী, নির্মলদা, শৈলজানন্দ, বিভূতি মুখুয্যে, ডাঃ সুশীল দে (ঢাকা ইউনিভার্সিটির খুব বড় একজন অধ্যাপক, লন্ডনের ডি-লিট) প্রভৃতি উপস্থিত। রীতিমত সাহিত্যিক আড্ডা। ওরা সবাই কেউ পুরী যাচ্চে, কেউ নাগপুর যাচ্চে, ডাঃ দে বোম্বে যাচ্চেন, সজনী ও তারাশঙ্কর গোয়ালিয়র যাচ্চে (সেই গোয়ালিয়র)—আমায় সজনী বললে—আপনি গেলে বেশ আড্ডা দিতে দিতে যাওয়া যেতো—কিন্তু আপনি রাঁচীতে সভাপতিত্ব নিয়ে আমাদের আমোদ মাটি করে দিলেন, নইলে আপনাকে জোর করে ধরে নিয়ে যেতাম। ভালোই হয়েছে গোয়ালিয়র যাই নি, তাহলে তো তোমাদের সঙ্গে পুজোর ছুটিতে আর দেখাই হোত না। ও আমার ভাল লাগে না হৈ হৈ করে বেড়ানো, চিরজীবনটাই তো হৈ হৈ করেই কাটিয়ে দিলাম। ইচ্ছে করে নিভৃত নিরিবিলি কোথাও দুদিন বিশ্রাম করি, অলস শরতের দুপুরে দূরশ্রুত ঘুঘুর উদাস কণ্ঠের সঙ্গীত শুনে জীবনস্বপ্নে বিভোর থাকি, জ্যোৎস্নারাত্রে ছাদে শুয়ে বিরাট তারাভরা আকাশের দিকে চেয়ে আপন মনে কত কথা ভাবি

প্রকৃতির কোলে শুয়ে সৌন্দর্যে ভাসায়ে আঁখি।
সাধ যায় দিবানিশি অনিমেষে চেয়ে থাকি।
নিঝুম নীরবে সেথা কি যেন চোখের 'পরে
উজল জ্যোছনা সম নিয়ত ঝরিয়া পড়ে।
পরমাণু নিভে যায় ভাঙিয়া জড়ের কারা,
কে তুমি ডাকিছ মোরে করিয়া পাগলপারা?

তবে এ সব সাধই। সাধ হলে কি হবে, তা হবার নয় তাও জানি। জীবনের জটিল কর্মভার থেকে আমার মুক্তি নেই কোনদিন।

চিঠি দিলাম এই লোভে, বৃহস্পতিবার পেয়ে যদি শুক্রবারে উত্তর দাও—তবে আমি রবিবারে পাবো। চিঠি দিও, ভারি আনন্দ পাবো তা হোলে, পুজোর ষষ্ঠীর দিন তোমার চিঠি পাই যদি। কেমন তো?

অনেক রাত হয়েছে। এখুনি চিঠি ডাকে দেবো নইলে কাল সকালে তাড়াতাড়িতে সময় হবে না।

আমার স্নেহাশীর্বাদ নিও ও বেলু, খোকা ও অন্যান্য বালক-বালিকাদের জানিও।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(৩)

প্রিয়তমাসু,

আজই বনগাঁ থেকে এসেচি সকালের ট্রেনে। কাল তোমাদের বাড়ি বদল করা হোল—কানুমামা সেজন্যে গিয়েছিল, জিনিসপত্র সব নিয়ে যাওয়া হোল, রাত নটার পরে আমরা জগহরি শা'র কন্যার বিবাহের নিমন্ত্রণ খেতে গেলাম, যতীনদা মন্মথদা ও আমি। শনিবারে গিয়ে দেখি গুট্‌কে এসেচে, সে কাল ছিল। সে গিয়েছিল খোকা, বাদু ওদের সঙ্গে। খেয়ে এসেআমরা বাড়ী বদল করলুম, অর্থাৎ শুতে গেলাম নতুন বাসায়।

যাবার আগে আমাদের ছোট্ট ঘরটিতে এসে একা দাঁড়ালাম একবার। জানালা দিয়ে জ্যোৎস্না এসে পড়েছে ঘরে, নির্জন বাড়িটা, কারণ বেলু, দুনু, খোকা ইত্যাদি সকলে জগহরির বাড়ি থেকে তখনো ফেরেনি। আমার কেবল মনে হচ্ছিল, যে বালিকার সঙ্গে এই ছোট্ট ঘরটির অতি ঘনিষ্ঠ ও মধুর সম্পর্ক, যার কতদিনের কত কথাবার্তা, ঝগড়া, বকুনি, আদর ভালবাসা, হাসি ও কান্না এই ঘরের হাওয়ার সঙ্গে মিশিয়ে আছে— সে যেন এইমাত্র এখানে ছিল, কোথায় গিয়েছে, এখুনি এল বলে। কতক্ষণ তার নীরব প্রতীক্ষায় একা জানলার ধারে দাঁড়িয়ে রইলাম জ্যোৎস্নার আলোয়, আধ-অন্ধকারে খাবারের ঘরের মেজেতে তার পদশব্দ শুনবার প্রত্যাশা করছি যেন প্রতিমুহূর্তে—কিন্তু সে কই এল না তো? সত্যিই এত কষ্ট হল মনে! যেন কাকে ছেড়ে যাচ্চি এই বাড়িতে—গত একটি বৎসরের কতদিন, কত রাত্রির উদ্বেগবিহীন আসরে যার ডাগর চোখের দৃষ্টি আমার নিঃসঙ্গতাকে দূর করেছে—মনে আনন্দ পরিবেশন করেছে—এই বাড়িতে তার আঠারো বৎসরের যৌবন ও নববিবাহিতার বহু অনভিজ্ঞ সাধ-আহ্লাদকে ফেলে গেলাম চিরকালের জন্যে এই বাড়িতেই তার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিনগুলি আনন্দপূর্ণ হয়ে উঠেছিল, বিবাহের পরে বহু বিনিদ্র রজনীর মধুময়ী স্মৃতিতে এই গৃহাভ্যন্তর আবেশাতুর, আজ সে পরিবেশ ত্যাগ করে যেতে হচ্ছে। আমার দীর্ঘনিঃশ্বাস কেউ দেখেনি, কিন্তু আমার মনে যে বেদনার সুর বেজেছিল, কারো মনে কি সে সুরের প্রতিধ্বনি নিজেকে মুখর করেনি?

কল্যাণী, পরশু আমাদের বিবাহের দিনটি। আমার মনে আছে। কাল চিঠি ডাকে দিলে, আমাদের বিবাহের দিনের প্রভাতে চিঠি তোমার হাতে পড়বে। বহুদূরের যন্ত্রসঙ্গীতের মত ধ্বনিত হোক তার মধ্যে আমাদের গত এক বৎসরের হাসি গল্প ও গান, প্রত্যাসন্না মিলনযামিনীর মত আনন্দে মুখরিত হয়ে উঠুক তার প্রতিটি ছত্র—যে আনন্দ সৃষ্টির আরম্ভ থেকে নর ও নারীর পরস্পরের পরিচয়ের পথে বিচিত্র সেতু রচনা করে রেখেচে, যা আলস্যকে বহন করে আনে না, মনে জাগায় শক্তি ও উৎসাহ।

আজ স্কুলে পদত্যাগপত্র দিয়েছি। তোমাকে বোধ হয় বলেছি, বনগ্রামে মেয়ে-স্কুলে হেডমাস্টারের পদ নেবার জন্যে হরিদা বলেছেন আমায়। এদিকে পদ্মপুকুর স্কুলের হেডমাস্টার সুশীল মজুমদার সজনীকে বলে রেখেচেন জানুয়ারী মাস থেকে আমি যেন তাদের স্কুলে চাকরি নিই। বোধ হয় ওঁরা কিছু বেশি মাইনে দেবেন— অবিশ্যি তার পরিমাণ আমায় বলেন নি — কিন্তু আজ আমি ডি. এম. লাইব্রেরীতে গিয়েছিলাম কিছু আগে—তারা বলে চাকরি ছেড়ে যখন দিলেন, তখন ও আর করবেন না। বই লিখে আপনার বেশ চলেই যাবে। আমাদের হেডমাস্টার খুব দুঃখিত হয়েচেন আজ আমি নোটিশ দিতে।

মিতের সঙ্গে কাল বনগাঁয়ে দেখা। অনেকদিন পরে দেশে গিয়ে তার খুব আমোদ হয়েছিল, কিন্তু দুপুরে একটু গুরুভোজনের পরে সন্ধ্যা পর্যন্ত ভাল হজম হয়নি বলে বনগাঁয়ের জলের বড় নিন্দে করলে লিচুতলার আড্ডায়। ঘাটশিলায় জলের গুণে সেখানে অত নেমন্তন্ন ইত্যাদিতে যথেষ্ট খেয়েও শরীর খারাপ হতে দেখা যায়নি।

বনগাঁয়ের আর খবর ভাল। তবে বীরেশ্বরের বড় অসুখ—পেটের পীড়া, হজম হয় না, শূলবেদনা—রক্তাল্পতা, চোখ হলদে—শরীর শীর্ণ। উনি ঘাটশিলা যেতে চান—আমি বলেছিদেবীপ্রসাদরা যে ঘরে ছিল, ওই ঘরদুটোর কথা। শরীরে একটু বল পেলে এবং শীত কিছু কমলে বোধ হয় যাবেন। আদিত্য দেবকে চেন? তুমি যদি না চেন, উমাকে বলো, আদিত্যের ছেলে সুখদার কাল বিয়ে হয়ে গেল কোড়ারবাগানে। জ্ঞানদা, সব্যসাচীর সম্পাদক আমার কাছে এসে তোমার আর একটা গল্প চেয়ে গিয়েচে তোমার যে দুটো গল্প এখানে আছে—তার মধ্যে থেকে একটা দিয়ে দেব?

আমি যশোহরে যাই নি—গেলে বড্ড ঠাণ্ডা লাগিয়ে সেই রাত্রের ডাউন মেলে ফিরতে হত—সে বড় কষ্ট। বিষ্ণুপুরের ওরা আবার চিঠি লিখেচে, দেখি কি হয়, আমি ১৭ই থেকে ১৯শের মধ্যে ঘাটশিলায় যাচ্ছি। তার আগে

মেসের দ্রব্যাদি ও বই বনগাঁয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে হবে—কিছু বই তোরঙ্গ ভর্তি করে ঘাটশিলায় নিয়ে যাব। এই মাসের পর আর মেসে থাকব না।

আজ কলকাতায় বড় একটা ঘটনা হয়ে গিয়েচে। দুপুরে ক'খানা এরোপ্লেন 'War Savings Week উপলক্ষে উড়নের ও ক্রীড়াকৌশল প্রদর্শনের মহড়া দিচ্ছিল, তার মধ্যে একখানা হঠাৎ dive করতে গিয়ে বড়বাজারে আমড়াতলা গলির মধ্যে পড়ে চূর্ণ হয়ে গেছে। শুনছি নাকি দুজন পাইলট মারা গিয়েছে। দেখতে গিয়ে দেখি পুলিশ ও সার্জেন্ট দাঁড়িয়ে, লোকে লোকারণ্য—পুলিশ কাউকে ঢুকতে দিচ্ছে না—ব্যাপার বুঝে চলে এলুম। আর একটা খবর, হক্ মন্ত্রিমণ্ডলী আজ পদত্যাগ করেচে। এই দুই ব্যাপারে শহর তোলপাড়। ট্রামে করে দলে দলে ছাত্রেরা চীৎকার করে slogan উচ্চারণ করতে করতে যাচ্ছে, খুব চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে এই উপলক্ষে।

আজ আসি। খেতে যাব....চাকর ডাকতে এসেচে দুবার। আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ কোর নুটু, বৌমা, উমা, শান্তি ও রাজেনকে স্নেহাশীর্বাদ জানিও।

ইতি

পুঃ। রেণু ও তার দাদা ঘাটশিলায় যেতে চেয়েছিল বড়দিনের সময়। যদি ওরা যায় কি ঘরদোরের কোন অসুবিধে হবে? অবিশ্যি ওরা থাকবে মোট ৪/৫ দিন। নুটুকে বোলো।

ঠিক হয়েছে আমরা সবাই একত্র হলে এখানে....অর্থাৎ তুমি বনগাঁয়ে এলে বারাকপুরে ঠিক সেই রকম পিকনিক করব। সেই বনসিমতলার ঘাটে, সেই জায়গায়। জগদীশবাবুও নাকি আবার আসবেন। মায়া কি কানুমামা, বেলু, দুলু, বাদু...জগদীশবাবু, আমি ও তুমি, মজার পিক্‌নিক্। বছর বছর বনসিমতলায় আমরা একবার রেঁধে খাব, বারাকপুরে আসবার সময়েও.... কেমন তো? ওটা করতেই হবে আমাদের। আর কেউ না আসে, বারাকপুরে এসেই তুমি আর আমি, আর অবিশ্যি আসবে গুটকে ও ইন্দু এবং বুধো ও মানী...আমরা একদিন ওখানে পিক্‌নিক্ লাগাব।

সোমবার, ১৫ই অগ্রহায়ণ। ১লা ডিসেম্বর '৪১।

(৪)

মঙ্গলবার

১০/৯/৪০

কল্যাণীয়াসু,

আমিও ভেবেছিলুম আজ তোমার পত্র আসবে। বেশ চমৎকার পত্র, তোমার প্রকৃতি বর্ণনা আমার এত ভাল লাগে! এবার যে 'পরচে' ক্রিয়াপদের ব্যবহার এত কম? কেন? সংশোধন করে দিয়েছিলাম বলে রাগ করোনি তো? ভয়ঙ্কর লেখার ভিড় পড়ে গিয়েচে। এই সপ্তাহের মধ্যে লেখা না দিলে আর কোন কাগজ নেবে না। এবার পুজোর কাগজগুলো একটু তাড়াতাড়িই বেরুবে। তোমার 'নীলোৎপল' গল্পটা আমার বেশ ভাল লেগেচে, ওটা 'গাল্পিক' কাগজে দেবো। সম্পাদক আমার এখানে আমার লেখার তাগাদায় আসবে, যদিও আমি বলেছি আমি এবার দিতে পারব না—তোমার লেখাটা দেবো।

তোমার বুনো শটী ফুলের গল্প বেশ লাগলো। সামান্য ঘটনা গুছিয়ে লিখবার গুণেই পড়তে ভাল লাগে এমন। বেশ ভাবুক মন কিন্তু তোমার, সময়ে সময়ে ভাবি, এত অল্প সময়ে এমন ভাবুক মন কোথায় পেলে?

আমার যখন তোমার বয়েস (সে যুগের কথা অবিশ্যি), তখন বনগাঁয়ের বোর্ডিংয়ে থেকে পড়ি, বারাকপুর ছেড়ে এসে মায়ের জন্যে বাবার জন্যে বিশেষ করে বারাকপুরের নদীতীর, গাছপালার জন্যে আমার মন খারাপ হোত এবং পুরানো দিনের কথা মনে পড়তো। যখন আমি ভাগলপুরে কাজ করি তখনও বারাকপুরের জন্যে মন কেমন করতো, তা থেকেই বোধ হয় 'পথের পাঁচালী'র উৎপত্তি।

চিরকাল বারাকপুর ভালবাসি। কেউ নেই সেখানে আপনার বলতে, তবুও যে যাই সেখানে, সে শুধু বারাকপুরের প্রকৃতির টানে, কি জানি কি দিয়ে আমার মন বেঁধেচে ওখানকার পল্লী প্রকৃতি! যদি সম্ভব হয় একদিন পুজোর ছুটিতে তোমাদের ওখানে যাবো নিয়ে। আমার মনে হয় তোমারও ভাল লাগবে।

হ্যাঁ, একটা ব্যাপার। গোয়ালিয়রে পূজায় পূর্ণিমা থেকে ভারতবর্ষের কবি ও সাহিত্যিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে—রাজদরবার থেকে নিমন্ত্রণ পাঠানো হয়েচে বাংলাদেশের কয়েকজন সাহিত্যিকের উপস্থিতি প্রার্থনা করে। তার মধ্যে আছে সজনী দাস, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, মোহিতলাল মজুমদার, মণীন্দ্রলাল বসু ও আমি। ১২ অক্টোবর তারিখে আপ দিল্লী এক্সপ্রেসে ওরা সবাই এখানে থেকে যাবে। ১৫ দিন সেখানে থাকতে হবে। সাহিত্যিকদের থাকবার জন্য রাজদরবার থেকে খুব ভাল বন্দোবস্ত করবে এবং মোটরে ও অঞ্চলের অনেক দ্রষ্টব্য স্থান দেখাবে। সজনীবাবুর বিশেষ অনুরোধ আমি যেন যাই। কাল সকালে সজনীবাবুর বাড়ি গিয়েছিলাম, সেখানে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ও ছিল। সবাই বললে, একসঙ্গে বেশ আড্ডা দিতে দিতে যাওয়া যাবে। তা ছাড়া যাতায়াতের খরচ স্টেট থেকে দেবে স্থির হয়েছে। সজনীর নামে ওরা টাকা পাঠিয়ে দেবে।

আচ্ছা, এখন কি করি আমি? যদি ১২ই অক্টোবর গোয়ালিয়র যাই দিল্লী এক্সপ্রেসে তাহলে যেখানেই থাকি ১১ তারিখে অর্থাৎ পুজোর পরে—একাদশীর দিন আমায় কলকাতায় আসতে হয়। ১৫দিন গোয়ালিয়রে কাটালে ২৭শে অক্টোবর পর্যন্ত সেখানে থাকতে হয়, কলকাতায় এসে পৌঁছুতে আরও দুদিন....অক্টোবর মাস শেষ হয়ে গেল। ছুটি বাকি রইল আর মোটে দশ দিন। এর মধ্যে কবে বা যাই চাটগাঁ, কবে বা থাকি বারাকপুর, কবে বা যাই বনগাঁ।

এ বাদে ঘাটশিলাতেও যেতে হয় তাহোলে ২রা বা ৩রা অক্টোবর....থাকা হয় মোটে ৭ দিন। এই সব বিবেচনা করে দেখে এখনও বুঝতে পারিনে কি করা উচিত। ভীষণ মুশকিলে পড়ে গিয়েছি কল্যাণী।

তারপর ধরো, যাওয়া নিজের ইচ্ছাতে, কিন্তু আসা পরের ইচ্ছায়। যদি সেখানে থাকার ভাল ব্যবস্থা বন্দোবস্ত দেখে সঙ্গীরা বলে বসেন একেবারে পুজোর ছুটিটা কাটিয়েই যাওয়া যাক, তবে তো আমি তাদের সঙ্গে ঝগড়া করে চলে আসতে পারবো না, সুতরাং ছুটির গোটা দিনগুলো গোয়ালিয়রেই কাটিয়ে আসতে বাধ্য।

হয়ে গেল বারাকপুর, হয়ে গেল বনগাঁ, হয়ে গেল চাটগাঁ।

তোমার কি মত কল্যাণী? আমি কিছুই বুঝতে পারচি নে এখনও, মন এদিকেও টানচে ওদিকেও টানচে।

যদিও কোনো কারণে গোয়ালিয়র যাওয়া না হয়, তবে আমার আগের ভ্রমণতালিকাঅনুসারেই কাজ করা যাবে। একটা বড় বাধা এই দাঁড়াবে যা বুঝচি, একখানা উপন্যাসের Contract হবার কথা হচ্চে, মিত্র ও ঘোষ কোম্পানীর প্রকাশকের সঙ্গে। তা যদি হয়, তবে যাওয়া হবে না কারণ হৈ হৈ করে ছুটিটা কাটিয়ে দিলে নিরিবিলি লিখবার সময় পাবো না।

আগের লাইনটা লিখবার পরে আমার ঘরটার নীচে রেডিওতে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের 'মরণ-মিলন' কবিতার আবৃত্তি করলে.... সেই যেটা আমি একদিন বনগাঁয়ের পুরনো বাসায় করেছিলুম, "অত চুপি চুপি কেন কথা কও"... সেইটি মনে আছে? এতক্ষণ চিঠি লেখা বন্ধ করে আবৃত্তি শুনছিলাম, বেশ করলে। দু'এর জায়গায় বেশ ভাল লাগলো...তবে বড্ড চীৎকার করতে হয় ওটাতে, ভাল দম রাখতে না পারলে ওটা ভাল করে আবৃত্তি করাযায় না। পরিশ্রমের কাজ ওটা আবৃত্তি করা। নৃপেনের যেন দু'জায়গায় দম রইল না....তাই আবার খুব নীচু সুরে আরম্ভ করলে। আমি ছুটির সময় ওটা আবৃত্তি করে শোনাব এখন।

'চাঁদের পাহাড়' ভাল লেগেচে মায়ের, খুব আনন্দের কথা। বেশ, ও-ধরনের adventure আরও লিখবো...আমারও ইচ্ছে রয়েচে লিখবার। তুমি তো আগেই পড়েছিলে, না? কি রকম লেগেচে লিখো। তোমাকে একটা কবিতা আবৃত্তি করতে হবে কিন্তু এবারে বনগাঁয়ে ছুটির সময়। কেমন ?

হায়, হায়, এবার পুজোর ছুটিটা মাঠে মারা গেল!

তবে ঘাটশিলা আমরা কিন্তু যাবোই। যে ক'দিনের জন্যেই হোক। মুশকিল হোল বেচারী রেণু-মায়ের। হয়তো সে মিথ্যেই অপেক্ষা করে থাকবে, সেখানে যাওয়া ঘটবে না। নিজের অনিচ্ছাতেও যে কত লোকের মনে কষ্ট দিই। এতে পাপ হয় কল্যাণী? তোমার কি মত? আচ্ছা তোমার চিঠিতে 'পুজোর ছুটিতে যে আপনি'—এই পর্যন্ত লিখে বলেচ 'থাক সে বলবো না' ও কথার মানে কি? সত্যি, কিছু বুঝতে পারিনি। পুজোর ছুটিতে আমি কি করব বলেছিলুম? বলবে না কল্যাণী? আমি বুঝি রাগ করতে জানিনে, না? আমার ভারি কষ্ট হয়েচে ও কথা কেন লিখেচ 'আমার মত সামান্যা মেয়ে কি জন্য আপনাকে তার কথা জানাবে' ইত্যাদি। কি কথা, বল তো? কিছুই বুঝলাম না। কি করবো বলেছিলুম বলো তো? লক্ষ্মীটি, না যদি বলো রাগ করবোই।

বুধবার চিঠির উত্তর চাইলে কি হবে, ওবেলা তোমার চিঠি পেলুম তখন স্কুলে বেরিয়েছি, স্কুল থেকে এসে উত্তর লিখলুম কাল বেরুবে এখান থেকে, পরশু বৃহস্পতিবারে সকালে পাবে। অতএব রাগ কোরো না। বেলু কেমন আছে? বেশ মেয়ে বেলু। তাকে আমার স্নেহাশীর্বাদ দিও এবং বালক-বালিকাদেরও জানিও। তুমি আমার স্নেহাশীর্বাদ গ্রহণ কোরো।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(৫)

৪১নং মির্জাপুর স্ট্রীট, কলিকাতা

কল্যাণীয়াসু,

কাল যথাসময়ে এসে পৌঁছেচি, অতএব কিছু ভেবো না। এখন সেদিনকার সেই ভ্রমণ আমার কাছে স্বপ্নের মত মনে হচ্ছে—তুমি ওখানে আছ, সামনে এখনও পাহাড় দেখতে পাচ্ছ—কিন্তু আমার সামনে শুধু ইটকাঠের স্তূপ আর ধোঁয়া, প্রকৃতির মনোরম দৃশ্য চোখের সামনে থেকে মুছে গিয়েচে। মনের অবকাশ মানুষের জীবনে যে কতবড় দরকারী জিনিস, তা এই কর্মব্যস্ত, যন্ত্রযুগের অত্যন্ত হিসেবী ও সময়নিষ্ঠ মানুষেরা কি বুঝবে? এতে মানুষকে টাকা রোজগার করায়, ভাল খাওয়ায় ভাল পরায়, ভাল গাড়ীঘোড়া চড়ায়—কিন্তু জীবনকে মরুভূমি করে রেখে দেয়। প্রকৃতির শ্যামল বনপত্রসম্ভার, নীল আকাশ, পাখীর কূজন, নদীর কলমর্মর, অস্তদিগন্তের সান্ধ্য মায়া, এসব থেকে বহুদূরে এক জলহীন, বৃক্ষলতাহীন মরু।

তাই এখানে এসে আজ বেশী করে মনে পড়চে সেদিন দুজনে পাহাড়ে, ঝর্ণার ধারে ও বনাঞ্চলে যে সুন্দর প্রভাতটি একত্রে বেড়িয়ে ছিলুম—সেই কথা—এখানে কেউ কল্পনা করতে পারে তেমনতর গোলগোলি ফুলের শোভা? Sir Richard Hooker একজন বিখ্যাত উদ্ভিদতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ১৭৭৬ সালে ভারতে এসে বহু বনপ্রদেশ থেকে এদেশের গাছপালার বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করেন। তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হচ্ছে Himalayan Journal-৫/৬ ভলুমে সম্পূর্ণ বিরাট বই। এই বইয়ের মধ্যে গোলগোলি ফুলের শোভার খুব প্রশংসা করে গিয়েছেন Hooker, তাঁর নিজের হাতে আঁকা এই ফুলের রঙিন ছবিও আছে ওই প্রসিদ্ধ গ্রন্থের মধ্যে। আমি তার হাতে আঁকা এই ছবি দেখেই প্রথম বুঝতে পারি উনি কোন ফুলের কথা বলছেন।

...আমি শিবরাত্রির আগের দিন যাবোএবং নিয়ে আসবো। নুটুকে বোলো যদি গাড়ি যোগাড় করতে পারে তবে একবার যেন তোমাদের মুসাবনী ঘুরিয়ে নিয়ে আসে।

কেন, তোমার চিঠি পড়ে দেখলুম তুমি ঘাটশিলাতেই তো থাকতে চেয়েছিল—তবে? ঘাটশিলা সত্যই ভাল জায়গা। বৌমাও খুব ভাল? থাক না দুদিন।

তোমরা আর একদিন ফুলডুংরি বেড়াতে যেও বিকেলের দিকে। অমন Space-এর রূপ আর কোথাও দেখবে না। বাংলাদেশে তো নয়ই। বনগাঁয়ে কি আছে, বনগাঁয়ে?

বেশি লিখবার সময় পেলুম না। সাড়ে ন'টা বেজেছে। এতক্ষণ অনেক লোকের ভিড় ছিল—একটু সময় করে চিঠিখানা লিখলুম। অনেক দিন পরে এসেছি, বহুলোক দেখা করতে আসছে।

'যুগান্তরে' সেদিনকার মিটিং-এর খবর বেরিয়েচে দেখলুম। আমার বক্তৃতাও বার হয়েচে। বনগাঁয়ে দেখেচেন সবাই নিশ্চয়ই।

সামনের শনিবারে ভাবচি বারাকপুর যাবো, রবিবার দুপুরে খেয়ে দেয়ে হেঁটে বনগাঁ যাবো। রাত্রিটা থেকে সকালে কলকাতা আসবো। তবে এখনো কিছু পাকাপাকি ঠিক নেই।

প্রীতি ও ভালবাসা নিও। পত্রের উত্তর কালই চাই কিন্তু.... বৌমা, উমা, শান্ত, নুটুকে স্নেহাশীর্বাদ জানিও।

প্রীতিবদ্ধ

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পুনশ্চঃ শিবরাত্রি সোমবারে, সুতরাং নুটুকে বলো শনিবার ২২শে ফেব্রুয়ারী বম্বে মেলের সময় স্টেশনে থাকতে। যদি কোন কারণে বম্বে মেলে না যাওয়া হয়, তবে রাঁচি এক্সপ্রেসে নিশ্চয়ই যাবো।

(৬)

Cambala Hills

বম্বে, আলটামন্ট রোড

রবিবার, ২৮/১২/৪৭

কল্যাণীয়াসু,

খোকার নামে একখানি চিঠি ইতিপূর্বে দিয়েছি। আজ ৪ দিন হয়ে গেল বোম্বাই শহরে। খুব একজন বড়লোকের বাড়ি আছি। খাওয়া-দাওয়ার রাজসূয় ব্যবস্থা। যেখানে আছি, সেটি বম্বে সহরের এক প্রান্তে একটি দ্বীপ, তার ওপর একটি পাহাড়। পাহাড়ের ওপর বাড়িটা। ঘরে তেতলার জানলা থেকে শুয়ে শুয়ে সমুদ্র দেখা যায়। কি সুন্দর সহরটি! যখন সমুদ্রতীরে সারি সারি আলো জ্বলে বড় বড় পাহাড়ের মত বাড়িগুলিতে, তখন অনেক রাত্রে উঠে কি মায়াময় যে দেখায় ! তোমার কথা মনে হয় তখন। এখান থেকে সভাস্থল ৭ মাইল, রোজ এঁদের মোটরে যাতায়াত করি। দু বেলাই। অনবরত সভা হচ্চে। এখানকার দ্রষ্টব্যস্থান বহু, তবুও মালাবারউদ্যান, মহালক্ষ্মী মন্দির, এপোলো বন্দর, Gateway of India ইত্যাদি দেখা হয়েচে। আজ গজেনরা নাসিক গেল মোটরে, ওরা অনেক দূরে থাকে, ৭ মাইল দূরে। সকালে ফোন করেছিল কিন্তু যেতে পারিনি। প্রবোধ সান্যাল ও আমি এইমাত্র সভাস্থলে বসে পরামর্শ করলুম, কাল এলিফ্যান্টা যাবো। ফিরবার পথে ঘাটশিলা নামবো। তুমি ভেবো না আমার জন্যে।

কাল জ্যোৎস্নারাত্রে মালাবার হিল-এর উদ্যান থেকে দূরের আরব-সমুদ্রের দিকে চেয়েছিলুম। সঙ্গে ছিল প্রবোধ, গজেন ও সুমথ। তোমার কথা এত বেশী করে মনে পড়ছিল! ভাবছিলুম বারাকপুরের বাড়ির পিছনের ঘরে জ্যোৎস্নালোকিত বাঁশবনের কথা—তুমি আর আমি গভীর রাত্রে কতবার জানলা খুলে চেয়ে চেয়ে দেখতাম, সে কথা মনে পড়লো। বোম্বাই সহরে তোমাকে একবার নিয়ে আসবো বাবলু বড় হোলে। যাঁদের বাড়ি আছি তাঁরা তোমাকে নিয়ে আসতে বলেচেন এখানে। নাসিকে ওঁদের বাড়ি আছে সেখানেও থাকতে বলেচেন। একদম শীত নেই এখানে। কখনো নাকি শীত পড়ে না এখানে। এখানকার আবহাওয়া নাকি এইরকম। দুপুরে রোদের বড় তেজ। সহ্য করা যায় না এত গরম। রাত্রে গায়ে একখানা পাতলা, চাদরও

লাগে না—শেষরাত্রেও না। বড় সুন্দর সহর। সমুদ্র ও পাহাড়ের এমন সমাবেশ এক জায়গায় কখনও দেখি নি। যেদিকে চাই সে দিকেই নীল সমুদ্র। ইলেকট্রিকে ট্রেন চলে, তার কত যে স্টেশন—গ্রান্ট রোড, ওয়াডেলা, বোরিভেলি, চার্চগেট, দাদর, মাতুঙ্গা—আরও কত স্টেশন শুধু সহরের মধ্যেই।

তুমি আশীর্বাদ নিও। বাবলুকে স্নেহাশীর্বাদ দিও। বাবলুর নামে যে চিঠি দিয়েচি তা বোধহয় এতদিনে পৌঁছেচে। মাকে সভক্তি প্রণাম জানিও। বালক-বালিকাদের আশীর্বাদ দিও। ভাল আছি। ঘাটশিলায় নামবো। কাল বোম্বাইয়ে সাধারণ ধর্মঘট। রেল, বাস, ট্রাম, কুলি, দোকান সব বন্ধ। কাল এলিফ্যান্টা যাওয়া হবে কিনা কি জানি। স্টিমারে চড়ে আরবসমুদ্র দিয়ে ৩/৪ ঘণ্টার পথ ঐ দ্বীপটি। ওখানকার পাহাড়ের গায়ে হিন্দু দেব-দেবীর অপূর্ব মূর্তি উৎকীর্ণ আছে। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীর তৈরি। ঐতিহাসিক ডাঃ সুরেন সেন আমার সঙ্গেই আছেন, তিনিই বললেন পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীর আগেকার নয় এ শিল্প।

বোম্বাইয়ে মারহাট্টা ও গুজরাটি বুলি সবাই বলে। হিন্দিও বলা হয় তবে খুব কম। হিন্দি বললে অনেকে বুঝতে পারে না। বাঙ্গালী ছেলেমেয়েরা চমৎকার মারহাট্টি বলচে।

তুমি ঘাটশিলার ঠিকানায় এর উত্তর দিও। কেমন তো? এখন বেলা দুটো। গাড়ি তৈরি, এখুনি আবার ৭ মাইল দূরবর্তী সভায় যেতে হবে। পথে কি সুন্দর আরবসমুদ্র পড়ে রাস্তার ধারে। ওলি বলে একটা জায়গায়। তার ডানপাশে মহালক্ষ্মী Race course—ঘোড়দৌড়ের জায়গা।

বারাকপুরের ফুচুর মাকে একখানা চিঠি দিও। ইতি—শ্রীবিভূতি

(৭)

ছোটনাগরা ফরেস্ট বাংলো

(সারান্ডা)

২৬/১১/৪৯

কল্যাণীয়াসু,

আজ আমরা এখানে এসেছি, ঘন জঙ্গলের মধ্যে ক'দিন মোটরে এক স্থান থেকে আর এক স্থানে থাকি। চারিদিকে শৈলশ্রেণীমণ্ডিত অপূর্ব দৃশ্য। বন, খুব বন, যেমন বামিয়াবুরুতে দেখেছিলে। কাল এক জায়গায় বনে বেড়াতে গিয়ে ভালুকের ও বাইসনের পায়ের চিহ্ন অজস্র দেখেছি। এখানে বাঘের বড় উপদ্রব সুরু হয়েছে আজ ২/৩ মাস। গত ১৫ দিনের মধ্যে ৩ জন লোককে বাঘেনিয়েছে এই বাংলোর আশে-পাশের জঙ্গল থেকে। ধনকুমার হো বলে একজন লোকের সঙ্গে দেখা হোল কাল, সে বললে ২৩ ফুট লম্বা একটা পাইথন সাপ সে মেরেছিল আজ কয়েক মাস হোল এই জঙ্গলে। কি সুন্দর যে বনের শোভা, কত ফুল ফুটে আছে সর্বত্র। কাল রাত্রে বাংলো থেকে ময়ূরের ডাক শুনেছি।

বাবলু কেমন আছে? আমার নাম করে কিনা? আমি ৩০ তারিখে মঙ্গলবার সন্ধ্যার সময়ে যে চক্রধরপুর লোকাল ট্রেন যায় ওখানে ৭টায়, ওতে ঘাটশিলায় পৌছুবো। যদি ও দিন না যাই, তবে পরের দিন নিশ্চয়। কেতো যেন স্টেশনে থাকে। আজ এখুনি আমরা এখান থেকে থলকোবাদ যাচ্চি। পথে বাবুডেরা নামক এক গভীর বনমধ্যস্থ বাংলোয় দুপুরের আহার সেরে নেবো। এখন বেলা নটা। চা খেয়ে বেরুচ্চি। হরদয়াল সিংয়ের গাড়ি—দু'খানা মোটর আমাদের সঙ্গে আছে। নুটু ও বৌমাকে আশীর্বাদ দিও। নুটু এ সময় এখানে আসতে পারলে খুব ভালহোত।

তুমি আশীর্বাদ নিও ও কেতোকে দিও। ইতি—শ্রীবিভূতি

(৮)

ইং—১৯/৮/৪০, সোমবার

কল্যাণীয়াসু,

বেশ মানুষ, নীরব কেন? তোমাদের আসবার কথা ছিল ও সপ্তাহে, রোজ চাবিটা দরওয়ানের কাছে রেখে যেতাম আর রোজ ভাবতাম আজ গিয়ে দেখবো ঠিক কল্যাণী এসেচে। তোমার জন্যে Rowntree চকলেট কিনে রাখলুম, ঘরে ফিরে রোজ রোজ নিরাশ হয়ে একদিন রাগ করে চকোলেট নিজেই খেয়ে ফেললাম। তারপর অবশ্য তোমার বাবার পত্র পেলুম, পেয়ে জানলাম আসা তোমাদের হোল না। নিরাশ তো হয়েই ছিলাম, তোমার ওপর অকারণ রাগও হয়েছিল। সত্যি কথা বলাই ভালো।

এবারও বনগাঁয়ে দুদিন আনন্দে কেটেছিল, সে কথা বলা বাহুল্য মাত্র। বেলুর জন্মতিথির শুভ অনুষ্ঠান ও আনন্দের মধ্য দিয়ে আমি আমার নিজের বাল্যদিনের অনুভূতি ফিরে পেয়েছিলাম। বিশেষত এই বর্ষাকালে। কেন যে বর্ষা ও শরৎ এই দুটি ঋতু আমার এত প্রিয় তা জানিনে কিন্তু আমার শৈশবের সকল স্বপ্নলোক যেন এক সময় জন্ম নিয়েছিল এই ঋতুর মধ্যে, তাই শরতের নীল আকাশ, পরিপূর্ণ ঝলমলে রৌদ্র, ঘন সবুজ বনঝোপ আমার মনে শৈশবের সেই হারানো জগৎকে আবার ফিরিয়ে আনে, যে জগতের রহস্য আমার কাছে কোনোদিন শেষ হবে না, জন্মান্তরের পথে কতবার যার সঙ্গে পরিচয় ঘটবে।

কল্যাণী, তোমার মধ্যে একটি ভাবুক মনের পরিচয় পেয়েই তোমায় ও-কথা লিখলুম। এ জগতে বেশির ভাগ লোকে বস্তুকে, অর্থকে, বিষয়কে, পদগৌরবকে বেশি করে বোঝে, ভাবানুভূতিতে বোঝে না। কিন্তু সেদিন যখন

বালুরঘাটের জীবনের প্রতি তোমার পিছুটানের কথা ও নানা জায়গার প্রকৃতিবর্ণনা শুনলাম, তখনি আমার মনে হয়েচে তুমি এসব বোঝো ও ভালোবাসো। ছেলেমানুষ হলেও এই কল্যাণময়ী প্রকৃতির রূপ অন্তত আবছায়া ভাবেও তোমার চোখে ধরা পড়েচে। সকলের পড়ে না।

এবার শরতে একদিন বনগাঁয়ে আমরা সবাই বৈকালের আকাশের তলা দিয়ে নদী বেড়াতে যাবো, নৌকোয় করে। নিশ্চয়ই তোমার খুব ভাল লাগবে, আমি বলতে পারি। শরতের নদীচরলগ্ন কাশবনের শোভা আশা করি পূর্বে অনেক দেখেচ, এবারও দেখাবো। তোমার গল্প লিখবার খোরাক জুটবে।

তোমার চিঠি না দেওয়া ভুল হয়েচে। রোজই দেখি চিঠি এসেছে কিনা। ভারি অন্যায়কল্যাণী। পত্র পেয়েই চিঠি দেবে। তোমায় এ কদিন পত্র লিখবো ভেবেছিলাম; রাগ করে লিখিনি—এখন সত্যি আর থাকতে পারলুম না। কেননা মন উদ্বিগ্ন হয়েচে। ভাবছি, অসুখবিসুখ হয়নি তো কল্যাণীর?

আমি একটা কবিতা লিখেচি। তোমায় পাঠালুম! ভাল করে নকল করে আমায় দিও না? কেমন হয়েছে? আমি সাধারণত তো কবিতা লিখি না।

তুমি স্নেহাশীর্বাদ নিও। খোকাখুকীদের জানিও। ষোড়শীবাবুকে সশ্রদ্ধ নমস্কার দিও।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পুঃ—তোমার জন্য আমার মন সত্যিই উদ্বিগ্ন হয়েচে, চিঠিপত্র পেয়েই দিও। ভুল না হয়, হয়, না হয়।

পুঃ—কপি করে তোমার বাবাকে কবিতাটি দেখিয়ে তাঁর মত নিও।তাঁর কেমন লাগে জানিও ঠিক আমাকে। তোমরা ভালো বললে একটা কাগজে দেবো।

নবযুগের কবি

দুঃখ হতে ক্ষতি হতে যে অমৃত করেছি সঞ্চয়
নিত্য পলে পলে
মৃত্তিকার ধরণীতে কণ্ঠ ভরি গাহি তারি জয়
নানা কুতূহলে
রজনীর অন্ধকারে অগণিত তারকার দ্যুতি
গগন অঙ্গনে
কি বিস্ময়ে হেরিয়াছি পুলকিত একা সারারাতি
মুগ্ধ শিহরণে—
মনে হবে জন্মে জন্মে জন্ম হতে নব জন্মান্তরে
মৃত্যুলোক পারে
সেই কথা রেখে যাব অরণ্যের পল্লব মর্মরে
ধরার দুয়ারে
দুঃখভরা পৃথিবীর কবি আমি নামগোত্রহীন
অখ্যাত অনামী
মানুষের চিত্ত মাঝে তবু ক'বে মোর মর্মবীণ

শাশ্বত সে বাণী
অনন্ত বেদনা মাঝে চিরন্তন সৃষ্টির সম্ভার
আনন্দ স্বরূপে
আমি যে দেখেছি তার প্রশান্ত স্বভাব
অপরূপ রূপে
তাই মোর কাব্যকথা নবছন্দে হয়েছে মুখর
অশ্রুজল মাঝে
কুসুম সঙ্গীতে তাই ধরিত্রীর ব্যাকুল অন্তর
ক্ষণে ক্ষণে বাজে।

(৯)

৪১, মির্জাপুর স্ট্রীট, কলিকাতা
৬ই ভাদ্র, '৪৭ সাল, বৃহস্পতিবার রাত্রি

কল্যাণীয়াসু,

তোমার চিঠিখানা আজই আশা করেছিলুম, কিন্তু যখন চিঠি পেলাম তখন স্কুলে বার হচ্চি, কাজেই আজ উত্তর দেওয়া সম্ভব হোল না, যদিও আজই উত্তর দিলে তবে শুক্রবারে পাও। আজ আবার বারবেলা ক্লাবের বৈঠক ছিল, সুতরাং সেখান থেকে রাত্রে ফিরে তবে চিঠি লিখচি, শনিবারে পাবে। তাতে একদিন দেরি হোল বটে, রাগ করতে পাবে না বলে দিচ্চি।

আমার চিঠি দিতে না হয় দেরি হয়েচে, তুমি তো চিঠি দিলে পারতে? কেন দিলে না? যদি মরে যেতাম ? কি করে জানলে আমার খুব অসুখ হয়নি? শুধু আমার দোষ দিলেই বুঝি চলবে? আমি তোমাকে চিনি না এমন সব ব্যবহার করি ? বোলো না ও কথা, কল্যাণী। অমন বল্লে আমার মনে কষ্ট দেওয়া হয়।

আমার কবিতা তোমাদের ভাল লেগেচে, ষোড়শীবাবুর ভাল লেগেচে জেনে খুব আনন্দ পেলাম। আজ ওটা বারবেলায় পড়া হয়েচে। আমার গল্প পড়ার কথা ছিল, কিন্তু গল্পটার আধখানা এখনও বাকি বলে পড়লাম না। ভাবচি, সামনের শনিবারে ঘাটশিলা যাবো, সেখানে সুবর্ণ সঙ্ঘের অধিবেশনে গল্পটা পড়বো।

নিশ্চয়ই যাবো তোমার জন্মদিনে। তোমাদের সাদর নিমন্ত্রণ কি উপেক্ষা করতে পারি, কল্যাণী? এই অল্পদিনের মধ্যে তোমাদের সঙ্গে যে আত্মীয়তা স্থাপিত হয়েচে—এখন মনে হয় কতদিন থেকে যেন তোমাকে জানতাম; বেলুকে জানতাম, মায়াকে জানতাম, যোড়শীবাবুকে জানতাম। কি জানি কেন এমন হয়!

আমার বইখানা (মরণের ডঙ্কা বাজে) তোমাদের ভাল লেগেছে, এতে সত্যিই আনন্দ পেলাম। তোমাদের সমঝদারিত্ব আছে, তোমাদের ভাল লাগলে অনেকেরই ভাল লাগবে এ আমার ধারণা।

তোমার উপর রাগ করেছিই তো। নিশ্চয় করেছি। উচিত ছিল না তোমার একখানা চিঠি দেওয়া? কত আশা করে থাকতাম প্রতিদিন তা যদি জানতে? আমি মরে যাই নি কি করে জানলে? হায়রে! আমি মরে গেলে কারই বা কি!

বেলু রাগ করলে তাকে খোকাখুকির দলে ফেলেচি বলে! হাসি পেল কথাটা পড়ে। সে খোকাখুকির দলে না তো কি? আচ্ছা যাক, এখন থেকে ওকে সে দলে ফেলবো না। বেলু কেমন আছে? বেলু? হয়েচে তো? বেলুর ওপর আমি রাগ করেচি কে বললে? ও ছেলেমানুষ, সব বলতে পারে, তুমি বিশ্বাস কোরো না সে কথা।

পরশু ঘাটশিলায় যাবো, সোমবার ছুটি আছে, মঙ্গলবার সকালে আসতেই হবে, থাকবার উপায় কি স্কুল কামাই করে? তুমি বেশ লোক, অমনি বলে দিলে তোমার কথা শুনিনে ? তোমার কোন্ কথা কবে না শুনিচি! বেলু সাক্ষী আছে। তোমার জন্মদিনে একটা গল্প পড়বার ইচ্ছে রইল। সেদিন কি সম্ভব হবে সাতভেয়েতলা যাবার—হবে না বোধ হয়। আগের দিন যদি হয় দেখা যাবে।

আমার কেবল ভয় হয় বনগাঁ থেকে তোমরা চলে যাও, তবে কি দুঃখই পাবো! এমন বন্ধুত্ব চলে যাবে ভাবলে মন বড় খারাপ হয়ে যায়।

অল্প লইয়া থাকি তাই মোর

যাহা যায় তাহা যায়—

মানুষের জীবনে যে কদিন আনন্দ করা যায়, আমি এই বুঝি। এই সম্বন্ধে গ্রীক কবিহিপোলিটাসের একটি বিখ্যাত কবিতার অনুবাদ আছে—"The apple tree, the singing and the gold' কবিতার একটি অতি বিখ্যাত ছত্র এটি।

যদি সম্ভব হয় এবার তোমাকে দুটি ভূতের গল্প শোনাবো। মনে করে দিও। তবে ভয় পেলে চলবে না কিন্তু। ভয়টয় আমি দেখতে পারি নে। অন্য দেশে মেয়েরা যুদ্ধে যাচ্চে আর আমাদের মেয়েরা ভূতের ভয়ে রাত্রে এ ঘর থেকে ও ঘরে যেতে পারবে না, এ কি ভাল কথা ?

রাত হয়েছে অনেক। আজ এই পর্যন্ত। তোমার জন্মদিনের আগের শনিবারে আবার দেখা হবে। আমার স্নেহাশীর্বাদ নিও ও বেলুকে এবং খোকাখুকিদের দিও। বেলু কেমন আছে? বেলু বড় ভাল মেয়ে।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়